একমুখি শিক্ষা বিপর্যয় আনবে

সাপ্তাহিক ২০০০ রিপোর্ট

মাধ্যমিক শিক্ষায় আগামী বছর থেকে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি কার্যকর হতে যাচ্ছে। এই সংস্কারের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য নামে কোনো বিভাগ থাকছে না। আমূল বদলে যাবে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি। এসএসসি পরীক্ষায়ও পরিবর্তন আসবে। ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক এমসিকিউ প্রশ্নের নম্বর ৪০ এবং রচনামূলক প্রশ্নের নম্বর ৬০ হবে এবং শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন দক্ষতা যাচাইয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের প্রবর্তন হবে। আগামী বছরের নবম শ্রেণীর ছাত্ররা প্রথম এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে। অন্যদিকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ৩০ নম্বরের মূল্যায়ন করবেন। আর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বেসরকারিকরণের ফলে বাজারে একই বিষয়ের একাধিক পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাবে।

একমুখী শিক্ষা

মাধ্যমিক স্তরের নবম দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য শিক্ষা সংবলিত বহুমুখী শিক্ষাক্রম পদ্ধতির পরিবর্তে সব বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ের একটি সমন্বিত সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ আগামী বছর যারা নবম শ্রেণীতে উঠবে তারা সবাই একই বিষয় পড়বে। এর নামকরণ করা হয়েছে একমুখী শিক্ষাক্রম। এই একমুখী শিক্ষাক্রমের নামকরণ এবং এই সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

'একমুখী' শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন নয়। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এধরনের শিক্ষাক্রম চালু ছিল। ১৯৬৩ সাল থেকে চালু করা হয়েছিলো বিভাগভিত্তিক শিক্ষাক্রম। অর্থাৎ আমরা আবার ৪৩ বছর পেছনে ফিরে যাচ্ছি। পুরাতন সেই পদ্ধতিতে ফিরে যাবার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে- অষ্টম শ্রেণী পাস করে ১৩ বছর বয়সের একজন শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে উপযুক্ত বিভাগ বেছে নেবার ক্ষেত্রে পরিণত বয়স নয়। অপরিণত একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরবর্তী জীবনে বেশ দুর্ভোগের কারণ হিসেবে দেখা দিতে পারে। এছাড়া একটি বিশেষ শাখায় লেখাপড়া করায় দেশ ও বিশ্বের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ভৌগোলিক, সামাজিক, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান আহরণ থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। এতে একজন পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার প্রস্তুতিতে ঘাটতি থেকে যায়। তাছাড়া তিনটি শাখা থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের মাঝে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে না, বরং বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। এ অঞ্চলের এবং উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা চালু আছে।

'একমুখী' শিক্ষায় মোট ৯টি বিষয়ের জন্য ১২০০ নম্বর বন্টন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি বিষয়ের জন্য ১০০০ নম্বর আবশ্যিক অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে এই বিষয়গুলো নিতেই হবে। একটি আবশ্যিক নৈর্বাচনিক বিষয়ের জন্য ১০০ নম্বর অর্থাৎ ৩টি বিষয়ের মধ্য থেকে শিক্ষার্থীকে যেকোনো একটি বিষয় বেছে নিতেই হবে। আর একটি ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য ১০০ নম্বর অর্থাৎ ৭টি বিষয়ের মধ্য থেকে শিক্ষার্থী চাইলে একটি বিষয় বেছে নিতেও পারে, আবার না নিলেও কোনো সমস্যা নেই।

বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টন হচ্ছে– আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বাংলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) ২০০ নম্বর; ইংরেজি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) ২০০ নম্বর; গণিত (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) ১০০ নম্বর; ধর্ম শিক্ষা (ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা থেকে একটি বিষয়) ১০০ নম্বর; সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে ১৫০ নম্বর, এর মধ্যে পদার্থ ও রসায়ন নিয়ে ভৌত বিজ্ঞানে ৭৫ নম্বর এবং উদ্ভিদ, প্রাণিবিদ্যা, পরিবেশ বিজ্ঞান ও জনসংখ্যা শিক্ষা নিয়ে জীব বিজ্ঞানে ৭৫ নম্বর; সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ১৫০ নম্বর, এর মধ্যে ইতিহাস ও ভূগোল নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান প্রথম পত্রে ৭৫ নম্বর এবং অর্থনীতি, পৌরনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে ৭৫ নম্বর এবং ব্যবসায় শিক্ষায় ১০০ নম্বর।

আবশ্যিক নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ অর্থনীতি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি থেকে যেকোনো একটি

বিষয় বেছে নিতে হবে এবং এর জন্য ১০০ নম্বর ।

আর একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ৭টি বিষয় যেমন- উচ্চতর গণিত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাণিজ্যিক ভূগোল, বেসিক ট্রেড, সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা এবং স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা থেকে যেকোনো একটি বিষয়ের জন্য ১০০ নম্বর।

উল্লেখ্য, ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা ও বৌদ্ধধর্ম শিক্ষায় ভাষা হিসেবে যথাক্রমে আরবি, সংস্কৃত ও পালি থাকবে। আবশ্যিক নৈর্বাচনিক বিষয় থেকে ছাত্র বা ছাত্রী যে কেউ যে কোনো বিষয় নিতে পারবে। তবে যদি কেউ এই অংশ থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পছন্দ করে তবে সে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিতে পারবে না।

পরীক্ষা পদ্ধতি

আগামী বছর ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর পরীক্ষা পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে সরকার নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন এই পদ্ধতির নাম স্কুল বেজ্‌ড এসেসমেন্ট (এসবিএ) বা বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন । ২০০৬ সাল থেকে সারাদেশে এই পদ্ধতি চালু হবে।

এসবিএ পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের সারা বছরের শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়ন করে শিক্ষকরা প্রতিটি বিষয়ে ৩০ নম্বরের ভেতরে নম্বর প্রদান করবেন। আর বাকি ৭০ নম্বরের মূল্যায়ন হবে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেমিস্টারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রতিটি বিষয়ে ৩০ নম্বর প্রদান করার জন্য ১০টি পরিমাপক নির্ধারণ করা হয়েছে।

যে পরিমাপকগুলোর ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের পঠিত প্রতিটি বিষয়ে বছরব্যাপী মূল্যায়ন করা হবে সেগুলো হচ্ছে– ক্লাসে উপস্থিতি ও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ; মূল্যায়ন (শ্রেণীভিত্তিক); এসাইনমেন্ট (একক বা দলভিত্তিক); আচরণ, মূল্যবোধ ও সততা; বক্তব্য উপস্থাপন বা একক ও দলভিত্তিক আলোচনা; নেতৃত্বের গুণাবলী; নিয়মানুবর্তিতা; সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ; খেলাধুলায় কৃতিত্ব এবং বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক ক্লাস। পরিমাপকগুলোর ভিত্তিতে ৩০ নম্বর ও সেমিস্টারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে ৭০ নম্বরের মূল্যায়ন করা হবে। পরে উভয় পদ্ধতির মূল্যায়ন নম্বর মিলিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্পের (সেসিপ) দেশী-বিদেশী পরামর্শকগণ ২০০২ সালে মাধ্যমিক স্তরের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নবম-দশম শ্রেণীকে বাদ দিয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে পরীক্ষামূলকভাবে পদ্ধতিটি চালু করে মূল্যায়নের নির্দেশ দেন। ২০০৪ সালে সারাদেশে ২০টি স্কুল ও ২০টি মাদ্রাসায় পরীক্ষামূলকভাবে এসবিএ পদ্ধতি চালু করা হয়। এছাড়া আরও ৪৯টি স্কুলে সেসিপ এই পদ্ধতি চালু করে। এর মধ্যে ৪০টি স্কুলের এসবিএ পদ্ধতি মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন পদ্ধতিটি সুফল বয়ে আনবে উল্লেখ করে সারাদেশে এবিএ চালুর সুপারিশ করা হয়। মূল্যায়ন রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়ে আগামী বছর থেকে সারাদেশে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে।

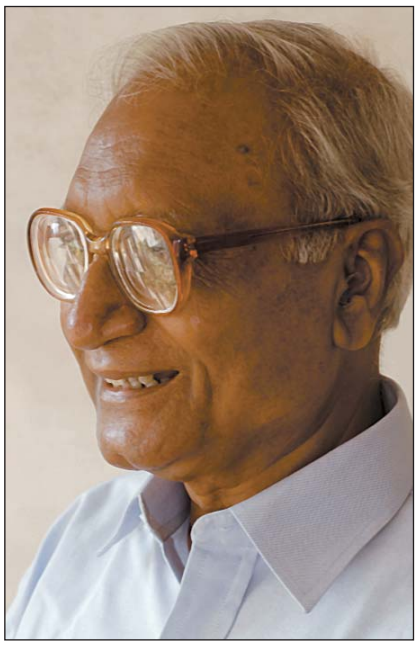

‘এ ধরনের একটি বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা, পরামর্শ ও অবহিতকরণ প্রয়োজন ছিল। চালু ব্যবস্থাকেই ঠিক ভাবে চালানো যাচ্ছে না। তার ওপর অন্যের পরামর্শে নতুন সংস্কার চাপিয়ে দেয়া আত্মহত্যার শামিল। শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো পরীক্ষাগার নয়। আলাদা গবেষণা করে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।’

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
শিক্ষাবিদ

প্রশ্নপদ্ধতি পরিবর্তন

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনটি বিষয় ছাড়া বাকি সব বিষয়ের এমসিকিউ প্রশ্নের নম্বর ৫০ থেকে ৪০ এবং রচনামূলক প্রশ্নের নম্বর ৫০ থেকে ৬০ নম্বরে পরিবর্তিত হবে। তবে ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র এবং বাংলা ২য় পত্রের প্রশ্নের বর্তমান পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকবে। সব বিষয়ের রচনামূলক অংশে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন করা হবে। আগামী বছর থেকেই নবম শ্রেণীতে এই নতুন পদ্ধতি চালু হবে। আর এসএসসি পরীক্ষায় এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে ২০০৮ সাল থেকে।

প্রশ্নের নম্বর বন্টন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার সময় বন্টনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রতিটি পরীক্ষায় রচনামূলক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীরা সময় পাবে ২ ঘন্টা ১০ মিনিট। আর এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য সময় থাকবে ৪০ মিনিট।

রচনামূলক অংশে বিভিন্ন দক্ষতা যাচাই উপযোগী কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন করা হবে। প্রত্যেক বিষয়ে মোট ৯টি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন করা হবে, এর মধ্য থেকে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে পরীক্ষার্থীদের। আর এমসিকিউ অংশে ৪০টি প্রশ্ন থাকবে এবং সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে।

শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা ছক অনুযায়ী প্রশ্ন প্রণেতারা এমসিকিউ পদ্ধতির প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। তবে ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র এবং বাংলা ২য় পত্রের নম্বর বন্টন ও প্রশ্নের ধরনে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। আর সব বিষয়ের ফলাফল প্রস্তুতের বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতিতে জিপিএ নির্ধারণের নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।

সংস্কার অনুমোদন প্রক্রিয়া ও অর্থায়ন

মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্পের (সেসিপ) সুপারিশের ফলাফল মাধ্যমিক শিক্ষার এই ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম। বিগত সরকার আমলে ১৯৯৯ সালের জুলাই থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে এই প্রকল্প প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছিলো আরও দু'বছর আগে ১৯৯৭ সালে। এর ওপরে জরিপ হয় ১৯৯৮ সালে। আর প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ১৯৯৯ সালে। তিনটি ভাগে প্রকল্পের মোট ১১টি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নির্ধারণ করা আছে। এর অন্যতম মাধ্যমিক শিক্ষাখাতের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কারিকুলাম উন্নয়ন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, পাঠ্যপুস্তক বেসরকারিকরণ, ছাত্র মূল্যায়ন ও পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার। এছাড়া স্কুল ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার

উন্নয়নসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্মসূচি রয়েছে।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪৯০ কোটি ২০ লাখ টাকা। এর ৭০ শতাংশ ৩৪২ কোটি টাকা আসছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কাছ থেকে শতকরা বার্ষিক দেড় শতাংশ হারে ঋণ হিসেবে। বাকি ৩০ শতাংশ ১৪৮ কোটি টাকা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। প্রকল্পের মেয়াদ এবছরের ডিসেম্বরে শেষ হবে। আর্থিক বরাদ্দের খাতগুলো হচ্ছে– স্কুল ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ভবন নির্মাণসহ অবকাঠামো খাতে ১৩৩ কোটি টাকা, উপকরণ, আসবাবপত্র ও যানবাহন ২২ কোটি, পরামর্শক ফি সাড়ে ৬৮ কোটি, জনবল উন্নয়ন পৌনে ৭ কোটি, জরিপ ৯ কোটি, স্কুল উন্নয়ন ২ কোটি, ছাত্রী উপবৃত্তি ১৮০ কোটি, বেতনভাতা ৫৭ কোটি এবং এডিপির সার্ভিস চার্জ সাড়ে ১১ কোটি টাকা।

অভিযোগ উঠেছে, একমুখী শিক্ষার জন্যই ৫০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বশিরুল হক এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, দেশী-বিদেশী পরামর্শদের পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, জরিপ ও কর্মশালার মধ্য দিয়ে একমুখীসহ শিক্ষা সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। জানা গেছে, প্রকল্পে ১৪ জন বিদেশী ও ১৬ জন দেশী বিশেষজ্ঞ কাজ করেছে। এদের জন্য আর্থিক বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৯ কোটি ৩৫ লাখ ও ৩ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। আর বিভিন্ন দেশে সফর ও স্থানীয় প্রশিক্ষণে বরাদ্দ ছিলো ১৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। আর এর সাপোর্ট মেটেরিয়াল খাতে বরাদ্দ ছিলো ৩ কোটি ২২ লাখ টাকা। তবে একমুখীসহ শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ ছিলো না। এবিষয়ে ব্যাপক সমালোচনার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি শিক্ষকদের বিষয়টি অবহিত করতে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে সেসিপ প্রকল্প শুরু হলেও এর কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে শুরু হয় বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর। ২০০২ সালে সেসিপ একমুখীসহ শিক্ষা সংস্কারের বিভিন্ন সুপারিশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই বছরের আগস্টে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান, নীতিমালা নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বেসরকারিকরণ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষে জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটি (এনসিসি) নামে একটি কমিটি গঠন করে। ২১ সদস্যের এই কমিটির প্রায় সকলেই আমলা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। এর বাইরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের একজন প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং একজন সাবেক আমলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত কোনো ব্যক্তিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ এই কমিটিতে রাখা হয়নি। এনসিসি সেসিপের একমুখী শিক্ষার সুপারিশ সম্পর্কে কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণের পরামর্শ দেয়। ২০০৪ সালে সেসিপ এর ওপরে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় রাজধানী ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক সংশ্লিষ্ট উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন শিক্ষক অংশ নেন। কর্মশালার ভিত্তিতে সেসিপ সুপারিশে বেশকিছু পরিবর্তন আনার পর এনসিসি তা অনুমোদন করে।

মজার বিষয় হচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা এই তিনটি ধারাকেই একমুখী শিক্ষার আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো। আর একারণেই এর নামকরণ করা হয়েছিলো একমুখী। বিষয়ের সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রথমে কারিগরি শিক্ষাকে বাদ দেয়া হয়। পরে মাদ্রাসা শিক্ষাকেও একমুখীর আওতামুক্ত করা হয়। কিন্তু একমুখী নামকরণটি উপযুক্ততা হারালেও এই নামটি আর পরিবর্তন করা হয়নি।

‘বাংলাদেশের মত একটি দেশের উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা সবচেয়ে বেশি দরকার। প্রচলিত ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী যখন উচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান পড়তে যায় তখন সে বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানের অভাবে অসম্ভব একটা ধাক্কা খায়। এখন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৪ বছরের পরিবর্তে যখন ২ বছরের বিজ্ঞান পড়ে কেউ উচ্চস্তরে বিজ্ঞান পড়তে যাবে তখন কি অবস্থা হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়।’

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
শিক্ষাবিদ

শিক্ষক সংকটের কারণে বিপর্যয়ের আশঙ্কা

২০০৫ সাল থেকেই সব স্কুল ও মাদ্রাসায় ‘একমুখী’ শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু সব স্কুল ও মাদ্রাসায় সব বিষয়ের শিক্ষক না থাকায় এবং শিক্ষক সংকটের মধ্যে একমুখী শিক্ষা চালু হলে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় সে সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়। শিক্ষক সংকটের সেই সমস্যার কোনো সমাধান না করেই আগামী বছর থেকে সব স্কুলে একমুখী শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ গত ৯ মাস ধরে বন্ধ থাকাসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষক সংকট আরও তীব্র হয়েছে। আগামী ৩/৪ মাসের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু না হবার আশঙ্কা থাকায় একমুখী শিক্ষা চালু হলে একধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। ২০০৫ সালে একমুখী শিক্ষা চালু না করে ২০০৬ সাল থেকে চালু করতে নতুন শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিলো– ২০০৬ সালে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু হলে স্কুল ও মাদ্রাসায় মোট ১২ হাজার ১৯০ জন অতিরিক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলে প্রয়োজন হবে ১ হাজার ৯৫৯ জন এবং মাদ্রাসায় ১ হাজার ২৩১ জন। প্রতিবেদনে ২০০৪ সালে বিজ্ঞান শাখার স্কুল, মাদ্রাসা ও শিক্ষক সংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছিলো–দেশের নিম্ন মাধ্যমিকসহ মোট মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৬ হাজার ৫৬২টি। এর মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক ছাড়া মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৩ হাজার ২৭৫টি। বিজ্ঞান শাখাসহ মাধ্যমিক স্কুল আছে ১১ হাজার ৭১১টি। এসব স্কুলে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক আছেন ১১ হাজার ৪৯৪ জন। আর স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক সংখ্যা ১১ হাজার ৭১৮ জন। বিজ্ঞান শাখাসহ স্কুলগুলোতেই ২২৪ জন বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক নেই। আর বিজ্ঞান শাখা ছাড়া ১ হাজার ৫৫৭টি স্কুলে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু

হলে ১ হাজার ৫৫৭ জন বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক প্রয়োজন হবে। ২২৪ জন সহ মোট বিজ্ঞান শিক্ষক প্রয়োজন হবে ১ হাজার ৭৮১ জন। আর ২০০৬ সালে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু হলে এর সাথে আরও ১০% নতুন শিক্ষকসহ মোট অতিরিক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রয়োজন হবে ১ হাজার ৯৫৯ জন।

সর্বশেষ ২০০৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী স্কুলের হিসাবে দেখা গেছে, নিম্নমাধ্যমিক ছাড়া মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৪ হাজার ৫৫২টি। এরমধ্যে ১৩ হাজার ৪০টিতে বিজ্ঞান শাখা আছে, মানবিক শাখা আছে ১৪ হাজার ৩২৪ টিতে এবং বাণিজ্য শাখা আছে ৭ হাজার ৫০৫টি স্কুলে। অর্থাৎ মোট ১ হাজার ৫১২টি স্কুলে বিজ্ঞান শাখা নেই, মানবিক শাখা নেই ২২৮টি স্কুলে আর ৭ হাজার ৪৭টি স্কুলে বাণিজ্য শাখা নেই।

বোর্ডওয়ারী হিসাবে ঢাকা বোর্ডে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৩ হাজার ৫১৩টি। এরমধ্যে বিজ্ঞান শাখা আছে ৩ হাজার ১৪৮টিতে, মানবিক ৩ হাজার ৪৪২টিতে এবং বাণিজ্য শাখা আছে ২ হাজার ৪৮৯টি স্কুলে।

রাজশাহী বোর্ডে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৪ হাজার ৫৬৪টি। এরমধ্যে বিজ্ঞান শাখা আছে ৪ হাজার ৩৯৬টিতে, মানবিক ৪ হাজার ৫২১টিতে এবং বাণিজ্য শাখা আছে ৭৯১টি স্কুলে।

কুমিল্লা বোর্ডে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১ হাজার ৪৪৫টি। এরমধ্যে বিজ্ঞান শাখা আছে ১ হাজার ৩৭৪টিতে, মানবিক ১ হাজার ৪১৮টিতে এবং বাণিজ্য শাখা আছে ১ হাজার ২৭১টি স্কুলে।

যশোর বোর্ডে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ২ হাজার ১৭৬টি। এরমধ্যে বিজ্ঞান শাখা আছে ১ হাজার ৬৫২টিতে, মানবিক ২ হাজার ১৪৭টিতে এবং বাণিজ্য শাখা আছে ১ হাজার ২৯৬ টি স্কুলে।

চট্টগ্রাম বোর্ডে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৮৪৮টি। এরমধ্যে বিজ্ঞান শাখা আছে ৮২৪টিতে, মানবিক ৮১৫টিতে এবং বাণিজ্য শাখা আছে ৬৯৩টি স্কুলে।

সিলেট বোর্ডে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৬২৯টি। এরমধ্যে বিজ্ঞান শাখা আছে ৫৪৮টিতে, মানবিক ৬২৯টিতে এবং বাণিজ্য শাখা আছে ৯৬টি স্কুলে।

বরিশাল বোর্ডে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১ হাজার। এরমধ্যে বিজ্ঞান শাখা আছে ১ হাজার ৯৮ টিতে, মানবিক ১ হাজার ৩৫২টিতে এবং বাণিজ্য শাখা আছে ৮৬৯টি স্কুলে।

এই বিপুলসংখ্যক স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ না করেই একমুখী শিক্ষা চালু করায় শিক্ষার্থীদের বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। এর আগে ১৯৮১ সালে একবার বিভাগ বিভাজন তুলে দিয়ে সমন্বিত সিলেবাস চালু করা হয়েছিল। কিন্তু কারিকুলাম না হওয়া এবং বই মুদ্রিত না হওয়ায় ৬ মাস ৬দিন পরে আবার তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। শিক্ষার্থীরা এই ছয় মাস হাতে লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়েছে। পরে তাদেরকে আবার পুরোনো পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

শিক্ষাবিদরা কিছুই জানেন না

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী একমুখী শিক্ষা চালুর ব্যাপারে তার কোনো মতামত চাওয়া হয়নি জানিয়ে বলেছেন, 'এ ধরনের একটি বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা, পরামর্শ ও অবহিতকরণ প্রয়োজন ছিল। চালু ব্যবস্থাকেই ঠিক ভাবে চালানো যাচ্ছে না। তার ওপর অন্যের পরামর্শে নতুন সংস্কার চাপিয়ে দেয়া আত্মহত্যার শামিল। শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো পরীক্ষাগার নয়। আলাদা গবেষণা করে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষার চেয়ে মাদ্রাসায়ও ইংরেজি মাধ্যমের সংস্কার বেশি দরকার। কিন্তু বার বার সাধারণ শিক্ষার ব্যাপারে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। তিনি সংস্কার কর্মসূচির সমালোচনা করে বলেন, শিক্ষকদের হাতে ৩০ নম্বর দেয়ায় এর অপব্যবহার হবে। গৃহশিক্ষকতার প্রবণতা বাড়বে। ধর্ম বিষয়টা ঐচ্ছিক হওয়া উচিত। সেটার সৃজনী সক্রিয় পরীক্ষা নেয়া বেশি প্রয়োজন।'

অধ্যাপক ড. মোজাফফর আহমেদও সংস্কার কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত নন জানিয়ে বলেন, 'দাতাদের পরামর্শেই মাধ্যমিক বিভাগ প্রথা চালু করা হয়েছিল। আবার তাদের পরামর্শেই তা তুলে দেয়া হচ্ছে। আসলে নিজস্ব একটা শিক্ষা নীতি না থাকার ফলে এটা হচ্ছে। শিক্ষায় বিভিন্ন ধারাকে একই ধারায় নিয়ে আসাটা বেশি জরুরি। তিনি শিক্ষকদের হাতে ৩০ নম্বর দেয়ার ব্যাপারে বলেন, এর অপব্যবহার যাতে না হয় সে ব্যাপারে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তবে এ ব্যাপারে ভালো শিক্ষকদের নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে।'

মুহম্মদ জাফর ইকবাল 'একমুখী শিক্ষা : জাতির জন্য আশা না আশঙ্কা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছেন, 'মাদ্রাসা বা ইংরেজি মাধ্যমে কোনো পরিবর্তন না করে শুধু মাধ্যমিক স্তরের বিভাগ তুলে দিয়ে সেই পরিবর্তনকে একমুখী শিক্ষা হিসেবেই দাবি করে জাতির সঙ্গে বড় ধরনের প্রতারণা করা হয়েছে। একমুখী শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ক্রসফায়ারে ফেলা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, নতুন ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিজ্ঞান শিক্ষা। অথচ, বাংলাদেশের মত একটি দেশের উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা সবচেয়ে বেশি দরকার। প্রচলিত ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী যখন উচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান পড়তে যায় তখন সে বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানের অভাবে অসম্ভব একটা ধাক্কা খায়। এখন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৪ বছরের পরিবর্তে যখন ২ বছরের বিজ্ঞান পড়ে কেউ উচ্চস্তরে বিজ্ঞান পড়তে যাবে তখন কি অবস্থা হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়। একমুখী শিক্ষায় বিজ্ঞান বলে যে বিষয়টিকে দাবি করা হয়েছে, আসলে সেটা গণিত ও বিশ্লেষণবিহীন একধরনের বর্ণনামূলক আলোচনা। একমুখী শিক্ষা আসলে বিজ্ঞান শিক্ষাকে পরিত্যাগ করার একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।'

প্রস্তুতির অভাব

২০০৬ সাল থেকে একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের যথাযথ প্রস্তুতি নেই। যারা নতুন এই পদ্ধতিতে পড়বে এবং যাদের সন্তানরা পড়বে তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এমনকি যারা পড়াবেন সেই শিক্ষকদেরও বিষয়টি বিস্তারিত জানানো হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক শাখায় বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া একমুখী শিক্ষা প্রবর্তন করার মাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থীকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. গাজী মোঃ আহসানুল কবির বলেছেন, ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক কিনতে পারবে। আর শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের সংস্কার কর্মসূচি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৯টি আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন ৩০ জন বিশেষজ্ঞের ১৫টি টিম প্রতি জেলায় প্রতিটি স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রত্যেক স্কুলের ৬ জন শিক্ষক এই প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন।

একমুখী শিক্ষাকে 'ষড়যন্ত্র' আখ্যায়িত করে তা প্রতিহত করার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজকর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে একমুখী শিক্ষা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটি। ১৭ সদস্যের এই কমিটির আহ্বায়ক প্রখ্যাত লেখক শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। ২৬ নবেম্বর শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দ ডিসেম্বর মাসে মতবিনিময় সভা, মানববন্ধন ও ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতীক অনশন ও সমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। প্রয়োজনে আরো কঠোর কর্মসূচি পালনের কথা বলেছেন তারা।